নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার

ভূমিকা

প্রিয় দেশবাসী

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয় ও নৈরাজ্যসহ দেশের এক সার্বিক ও গভীর সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে এবং প্রায় দুই বছর একটি সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশ পরিচালিত হওয়ার পর, অবশেষে বহু প্রত্যাশিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

নিকট অতীতে ৯০-এর দশকের শুরুতে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর দেশে গণতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী তিনটি সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপে এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমে বিএনপির গণবিরোধী শাসন, তারপরে আওয়ামী লীগের অপশাসন এবং সর্বশেষ বিএনপি-জামাত চক্রের দুঃশাসন দেশকে এক দ্বি-দলীয় মেরুকরণভিত্তিক লুটপাটতন্ত্র, জনজীবনে অসহনীয় ও ক্রমবর্ধমান সঙ্কট, জাতীয় স্বার্থের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত, সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরতা, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার দুষ্টচক্রের মধ্যে দেশ ও জনগণকে আটকে ফেলে।

এই সময়কালে বিএনপি'র প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় এবং আওয়ামী লীগের আপোষকামিতার ফলে জামাত রাজাকারসহ মৌলবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বোমাবাজিসহ সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে সারাদেশে সশস্ত্র জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবং সরকার ও রাষ্ট্র কাঠামোতে গভীর অনুপ্রবেশ ঘটাতে তারা সক্ষম হয়।

বিএনপি-জামাত জোটের ৫ বছরব্যাপী দুঃশাসন দেশকে উপহার দিয়েছিল সীমাহীন লুটপাট, কুৎসিত দলীয়করণ, জনজীবনে অসহনীয় দুর্ভোগ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, পরিবেশ বিপর্যয়, বিচার ব্যবস্থার সঙ্কট, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং সর্বোপরি রাজাকার সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর তাণ্ডব। এছাড়াও এ সময়কালে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ আমাদের দেশে আরো নির্লজ্জভাবে বৃদ্ধি পায়। 'কালা জাহাঙ্গীর' 'বিউটি আপা' প্রমুখ মার্কিন কূটনীতিকরা ব্রিটিশ আমলের 'বড় লাটে'র মতো আচরণ করতে ও শাসকদলসহ বড় বুর্জোয়া দলগুলোর কাছ থেকে সে রকম 'দাসসুলভ আচরণ' পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শোষিত-বঞ্চিত-বিক্ষুব্ধ জনগণ এসব দুঃশাসন নিরবে মেনে নেয়নি। শামসুনড়বাহার হল, কানসাট, ফুলবাড়ি, শনির আখড়ায় এবং খুলনার পাটকল শ্রমিক, নারায়ণগঞ্জ ও আশুলিয়ার গার্মেন্টস শ্রমিক, গ্রামাঞ্চলের ক্ষেতমজুররা নানা ধরনের জঙ্গি সংগ্রামে এ সময় অবতীর্ণ হয়েছে। গ্যাসসহ জাতীয় সম্পদ ও চট্টগ্রাম, মংলা বন্দর রক্ষায় বড় বড় লংমার্চসহ ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টিসহ বামপন্থীরা এসব সংগ্রামের অগ্রভাগে থেকেছে। বুকের রক্ত ঢেলে বামপন্থীরা এ সময় বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে যুগপৎভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে।

এখানেই শেষ নয়, বিগত সরকারগুলোর আমলে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশও রুদ্ধ হয়েছে। এদের শাসনামলে জাতীয় সংসদ মূলত ছিল অকার্যকর এবং তা কার্যত পরিণত হয়েছিল লুটেরা ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাফিয়া, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও সরকারি-বেসরকারি আমলাদের ক্লাবে। তাদের দলীয়করণ, কালো টাকা ও পেশীশক্তির দাপটে নির্বাচনসহ ক্ষমতা হস্তান্তরের চলতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটিও জনগণের আস্থা হারায়। এই সঙ্কট ঘনীভূত হয় বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে। তারা একটি সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে গদি দখল করে রাখার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালায়। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের এই দুঃশাসন এবং পুনরায় ক্ষমতা দখলের মরিয়া অপচেষ্টা দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুত লুটেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর অধীনে গোটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী-বিদেশী শোষক-শাসক শ্রেণী সৃষ্ট সঙ্কট সামাল দেবার জন্য ১১ জানুয়ারির পরিবর্তন সংঘটিত করে। আর এই প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনী বিশেষ ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এভাবে ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে।

ভাই ও বোনেরা

ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী জরুরি আইন জারী করে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ও শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নেয়া হলেও, মালিকদের নানা তৎপরতা চালাবার সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকে। শহর, বন্দর, গ্রাম ও পথে-ঘাটে নির্বিচারে হকার ও বস্তি উচ্ছেদের ফলে স্বনিয়োজিত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়। সার সমস্যা ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। নয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মানুষকে সবচেয়ে বেশি দিশেহারা করে ফেলে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি। জনজীবনের ক্রমবর্ধমান ও অসহনীয় যন্ত্রণা মানুষকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। শোষক-শাসক শ্রেণীগুলোকে একটি নৈরাজ্যমুক্ত ও প্রশান্ত শাসন কাঠামো উপহার দেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সব সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল তার প্রায় কোনটাই সফল হয়নি। তিন দশক ধরে প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর লুটেরা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে দেয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাধাগ্রস্ত ও নিষ্ফল হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দেশে বিদ্যমান দ্বি-দলীয় রাজনীতির ধারা যে তাদের স্বার্থ আর রক্ষা করতে পারছে না– একথা বুঝতে পেরে দেশী-বিদেশী শাসকশ্রেণী নিত্য নতুন ফর্মূলা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। শুরু হয় এনজিও ও সুশীল সমাজের বিরাজনীতিকীকরণের অভিযান, নয়া অনুগত শক্তির লালন, 'কিংস পার্টি' গঠন, পাঁচ-দশ বছরের জন্য জাতীয় সরকার, দীর্ঘমেয়াদী সেনা শাসন, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনসহ নানা ফর্মূলা বাস্তবায়নের তৎপরতা। দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করার বদলে চলে ঢালাওভাবে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার। জনগণকে ঘরে আবদ্ধ করে রেখে, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পর্দার অন্তরাল থেকে ষড়যন্ত্রমূলক পথে উপর থেকে 'সংস্কার' করার এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচনকে টাকার খেলা, পেশীশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রশাসনিক কারসাজি প্রভৃতি থেকে মুক্ত করার জন্য মূল গণদাবিগুলো বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রথমদিকে কিছু আগ্রহ দেখালেও, কথিত বড় দল দু'টি এবং বিত্তবান ও অপরাধী চক্রের চাপের কাছে ক্রমান্বয়ে নতি স্বীকার করে সংস্কার প্রস্তাবকে শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য করে ফেলা হয়েছে। ফলে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের সংগ্রাম আগামীতেও চালিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ বন্ধ করার দাবিতে সংগ্রাম জোরদার হয়েছে। সেক্টর কমান্ডারস্ ফোরামসহ বিভিন্ন মঞ্চ থেকে পরিচালিত এসব সংগ্রামের মাধ্যমে এই দাবিতে ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। কোণঠাসা হয়ে পড়ায় জামাতসহ এই অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি নানা মিথ্যাচার অপ্রচার ও ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়া শুরু করেছে এবং নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পাল্টা আঘাত হানার জন্যও তারা মাঠে নেমেছে।

এটা আজ প্রমাণিত যে, সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, লুটপাটতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নীতি ও শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে এবং স্বৈরাচার ও রাজাকারের শক্তিকে ভাগাভাগি করে কোলে টেনে নেয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি কেন্দ্রীক যে দ্বি-দলীয় রাজনীতির চক্রে দেশ আজ আবদ্ধ, তা অব্যাহত থাকলে জনগণের ভাগ্যের মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। এমনকি একই রকম আর্থ-সামাজিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জাতীয় সরকার, ঐকমত্যের সরকার, সুশীল সমাজের সরকার অথবা তথাকথিত কোন 'তৃতীয় মেরুকরণ'- এসব কোনো কিছুই জনগণের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারবে না। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য শুধু গদিরই নয়, নীতি ও ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বিদ্যমান দ্বি-দলীয় মেরুকরণের বাইরে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তির নেতৃত্বে 'বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন' সাধন করতে হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিন ধরেই 'বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প' গড়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এ জন্যই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কথিত ১৪ দল বা মহাজোটে শরিক না হয়ে স্বাধীন অবস্থান বজায় রেখে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সিপিবি প্রকৃত বিকল্প শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলার প্রয়াসে নীতিনিষ্ঠ থেকেছে। কিন্তু দুঃখজনক হল, বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ার এই প্রয়াসকে কার্যকর করার উপযুক্ত সময় যখন উপস্থিত হল, তখন বিকল্প গড়ার সংগ্রামের কিছু শরীক দলকে আর পাশে পাওয়া গেল না। তাদের একটি অংশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে নাম লেখালো। আর অন্য অংশটি নানা দ্বিধা-সংশয় ও সংকীর্ণতার কারণে ঐক্যবদ্ধ বামজোটে থাকলো না। ফলে একক স্বাধীন উদ্যোগেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণ বার বার স্বৈরাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। বহুবার সরকার বদল হয়েছে। অথচ গদির বদল হলেও, নীতির বদল হয়নি। বরং বারংবার জনগণের স্বার্থের সঙ্গে বেঈমানী করা হয়েছে। ফলে জনজীবনের সঙ্কট ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। লুটপাট ও শোষণ করাই আমাদের দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী বুর্জোয়া ধারার দলগুলোর লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক কোম্পানির তোষামোদ করা বা তাদের কমিশন এজেন্ট হয়ে সন্তুষ্ট থাকাই এদের নীতি। এই কারণেই বার বার শাসক বদল হয়েছে, কিন্তু শাসন করার নীতির কোনো বদল ঘটেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৭ বছরের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে।

সিপিবি মনে করে যে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে জনসম্পদের বিকাশ, প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র মানুষের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-কাজের নিশ্চয়তা, সন্ত্রাস দমন, ঘুষ-দুর্নীতি প্রতিরোধ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, আইনের শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও জনগণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলো নিরঙ্কুশ করা– এসব বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি কাজ। এজন্য বন্ধ শিল্প কল-কারখানা চালুসহ বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এক বলিষ্ঠ বহুমুখী অভিযানের সূচনা করতে হবে। এসব কাজ সম্ভব করতে হলে, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর চাপিয়ে দেয়া মুক্তবাজার, উদারীকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রভৃতি নীতি বাতিল করতে হবে। কৃষি-কৃষককে রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কৃষি ও কৃষককে ভর্তুকি দিতে হবে। লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া মুক্তবাজার অর্থনীতির পথ পরিত্যাগ করে গণবন্টনব্যবস্থা, রেশনিং ইত্যাদিসহ উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় ও সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শোষণ-বৈষম্য-বঞ্চনা দূর করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের আরোপিত নীতিমালা বাতিল এবং লুটেরা পুঁজিবাদী ধারা পরিত্যাগ করে, মুক্তিযুদ্ধের পরে সমাজতান্ত্রিক ধারায় যে রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষিত হয়েছিল, সে পথে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর করতে হবে। সিপিবি ক্ষমতায় গেলে এই কাজগুলোকে প্রাধান্য দেবে এবং তারা প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় নীতি ঢেলে সাজাবে। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, 'সাম্রাজ্যবাদ-লুটেরা পুঁজিবাদ-

সাম্প্রদায়িকতা'- এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ছাড়া জনগণের ভাগ্যের কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। আর তাই এই মৌলিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প ধারায় গণসংগ্রাম গড়ে তুলছে কমিউনিস্ট পার্টি।

প্রিয় দেশবাসী

দুনিয়া আবার বদলাতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশে বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক বা বাম মনোভাবাসম্পন্ন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ইরাক থেকে আজ বেত্রাহত কুকুরের মতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে লেজ গুটাতে হচ্ছে। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর্থ-সামাজিক বিকাশ দ্রুত গতিতে ঘটছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে তাদের শক্তি বিকশিত করছে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর নেপালের কমিউনিস্টরা এখন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ায়, সে দেশে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণ তীব্র হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে এক বিস্ফোরোন্মুখ অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তথাকথিত উন্নয়নের সিংহভাগ জমা হয়েছে ধনীদের পকেটে। অথচ লুটেরা-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে এবং এতোসব সঙ্কটের মধ্যেও যেটুকু আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার কৃতিত্বের দাবিদার হল– শ্রমিক-কৃষক ও ক্ষুদে-মাঝারী উদ্যোক্তাসহ মেহনতী ও প্রবাসী শ্রমজীবী জনগণ। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় আসীন হলে, বাংলাদেশের পক্ষে অচিরেই অসাধ্য সাধন সম্ভব।

তাই আসুন, বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি ও নেতৃত্ব গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে–

সর্বগ্রাসী সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য লুটপাটতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার লক্ষ্যে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে জয়যুক্ত করি।

স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, সাম্প্রদায়িক, লুটেরা ও সন্ত্রাসীদের পরাজিত করি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই মূল লক্ষ্য সামনে নিয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে সিপিবি নিম্নোক্ত ২৪ দফা কর্মসূচি দেশবাসীর সামনে উত্থাপন করছে এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংসদে ও সংসদের-বাইরে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোর দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

(১) দ্রব্যমূল্য

ক. দেশব্যাপী দক্ষ ও শক্তিশালী গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। গরীব মানুষের জন্য স্থায়ী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা। 'টিসিবি' ও 'বিএডিসি'কে সক্রিয় করা। সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরকারি 'বাফার স্টক' গড়ে তোলা। 'টেস্ট রিলিফ' চালু করা।

খ. বাজার-সিণ্ডিকেটের অপরাধ চক্র সমূলে উৎপাটন করা, মজুদদারি কঠোরভাবে দমন করা। খাদ্যে ভেজাল মেশানো, রঙ ব্যবহার কঠোরভাবে দমন করা। 'খাদ্য নিরাপত্তা আইন' প্রণয়ন করা। এই আইনে সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা। 'ভোক্তা অধিকার আইন' প্রণয়ন করা।

গ. মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বেচ্ছাচারিতা কঠোর হাতে দমন করা। লুটপাটের অর্থনীতি বাতিল করে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) ঘুষ-দুর্নীতি-সন্ত্রাস

ক. সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চস্তরসহ সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 'ন্যায়পাল ব্যবস্থা' চালু করা। স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে 'দুর্নীতি দমন কমিশন'-এর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ঘুষ-দুর্নীতি ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

খ. রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের এবং দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

গ. বিদেশী কোম্পানির সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. সকল বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, অস্ত্র কারখানা ও বোমা বানানোর কেন্দ্র ধ্বংস, অস্ত্র-বোমার মজুদ উদ্ধার, অপরাধী চক্রের ঘাঁটি ও নেটওয়ার্ক নির্মূল, মাফিয়া-গডফাদারদের দমন এবং অপরাধী চক্রের দেশী-বিদেশী অর্থ ও শক্তির উৎসসমূহ উৎপাটনে সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা। রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী লালন করার ব্যবস্থা উৎপাটিত করা।

ঙ. চোরাচালানি, কালোবাজারি, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, পেশাদার অপরাধী-খুনি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধী চক্রকে কঠোরভাবে দমন করা। আন্তর্জাতিক মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা এবং এসবের স্মাগলিং রুট অথবা পরিবহণের ট্র্যানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করার অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা।

চ. সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, আইনগত সর্বশক্তি নিয়োজিত করার পাশাপাশি জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সংগঠিত করে তাকে একটি সর্বাত্মক জাতীয় অভিযান রূপে গড়ে তোলা।

(৩) কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

ক. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য অর্থনৈতিক নীতি-দর্শনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও মৌলিক সংস্কার সাধন এবং পাশাপাশি সমবায় ও ব্যক্তিমালিকানা খাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার কার্যকর ও অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতি বছর ন্যূনতম ১০% নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য ক্রমান্বয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে দেশের সর্বত্র সারা বছর বিশেষত মঙ্গা ও খরা মৌসুমে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম চালু করা। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের কাজ পাওয়ার অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকারে পরিণত করা।

খ. মঙ্গা ও অর্ধাহার-অনাহার পরিস্থিতি মোকাবেলা, দারিদ্র্যপীড়িত, নিরনড়ব জনগণের জন্য বসতভিটা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা-সেবাসহ বেঁচে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুমুখী কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া।

গ. বিকল্প মাথা গোঁজার ব্যবস্থা ছাড়া শহরের বস্তিবাসীসহ কাউকে তার বর্তমান বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা। গ্রামীণ অর্থনীতির ও গ্রামজীবনের আমূল পুনর্গঠন ও উন্নতি বিধান করে গ্রামের মানুষের ব্যাপকভাবে শহর অভিমুখী আগমন প্রবণতা মন্থর ও রোধ করা। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার, রিক্সা উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করা।

ঘ. দরিদ্র, অনাহারি, বেকার, অসহায় মানুষের জন্য ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানব সম্পদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণসহ ব্যাপক কার্যক্রম অগ্রাধিকারমূলকভাবে গ্রহণ করা। এই খাতে সমন্বিত বাজেট বরাদ্দ সর্বাধিক করা। সেই সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সামাজিক ও নাগরিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। শহর ও গ্রামের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার প্রক্রিয়া শুরু করা। সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করা।

(৪) কৃষি, কৃষক, ক্ষেতমজুর

ক. গ্রাম থেকে ঢালাওভাবে উদ্বৃত্ত উঠিয়ে আনার মুক্তবাজার অর্থনীতি নির্দেশিত নীতি পরিবর্তন করে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেই প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছনড়ব উদ্বৃত্তের সিংহভাগ বিনিয়োগ করা।

খ. খোদ কৃষক ও গ্রামের মেহনতি মানুষের স্বার্থে আমূল ভূমি সংস্কার, কৃষি সংস্কার ও গ্রাম জীবনের মৌলিক পুনর্গঠন করা। কৃষি ও কৃষকের উৎপাদন সমস্যাগুলো সমাধান করা। বীজ, সার, ঋণ, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি ইত্যাদি খোদ কৃষকের জন্য সহজলভ্য করা। ক্ষতিকর হাইব্রিড বীজ আমদানি নিষিদ্ধ করা। বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেট ফার্মিং করার সুযোগ বন্ধ করা। কৃষি পণ্যের উৎসাহমূলক ও ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। জাতীয় স্বার্থে কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সাবসিডি প্রদান করা এবং খোদ কৃষক কর্তৃক তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

গ. গ্রামাঞ্চলে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগসহ কৃষি বহির্ভূত আর্থিক কর্মকাণ্ড এবং বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করা। ক্ষেতমজুরদের জন্য সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা। 'কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা স্কিম' চালু করা। প্রজেক্টের কাজে দুর্নীতি, গম চুরি দমন করা। স্বল্প মূল্যে রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা। খাস জমির সকল অবৈধ বন্দোবস্ত বাতিল করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টনসহ খাস খতিয়ানের খাল, বিল, জলাভূমি ইত্যাদি বন্দোবস্ত প্রদান নিশ্চিত করা। ক্ষেতমজুরদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

ঘ. জলমহাল ও ভাসান পানিতে প্রকৃত জেলেদের মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করা। জলীয় ব্যবস্থা সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় অভয়াশ্রম তৈরি ও সংরক্ষণ করা। দেশের ৫২ জলাভূমিকেন্দ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা ও আহরণস্বত্ব দরিদ্র ও প্রান্তিক জেলেদের হাতে দেয়া।

ঙ. গবাদী পশু-পাখি পালন কার্যক্মকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উৎপাদকদের সমবায়ভিত্তিক খামার প্রতিষ্ঠায় সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা। গবাদি পশু-পাখির রোগবালাই বিশেষত বার্ড ফ্লু, ম্যাড কাউ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বীমা সুবিধার ব্যবস্থা করা।

চ. কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করা। খোদ কৃষক যেন জমি না হারায়, তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গ্রামাঞ্চলে নিঃস্বকরণ প্রপ্রিয়া বন্ধ করা।

৫) শিল্প, শ্রমিক ও কর্মচারী

ক. বন্ধ কল-কারখানা চালু করা। ব্যাংক-বীমা, টিএন্ডটি, বিদ্যুৎসহ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করা। ইতোমধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিসহ সরকারি মালিকানায় ফিরিয়ে আনা। পাট শিল্পকে রক্ষার জন্য কার্যকর বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ও দেশে উৎপাদন করে চাহিদা মেটানো যায়, এমন সব দ্রব্যের আমদানী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

গ. গার্মেন্টস্ শিল্পে ও অন্যান্য কল-কারখানায় দুর্ঘটনা রোধ, শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত, ফ্যাক্টরি আইন পূর্ণভাবে কার্যকর কার।

ঘ. ৪,৫০০ টাকা জাতীয় নিমড়বতম মজুরি নির্ধারণসহ মজুরি কমিশনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। জীবনযাত্রার ব্যয়ের উর্ধ্বগতির সঙ্গে মিল রেখে মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু করা এবং মজুরি কাঠামো ২ বছর অন্তর অন্তর পুনর্বিন্যাস করা। ক্ষেতমজুর, কৃষিশ্রমিক ও

অসংগঠিত শ্রমজীবীদের জন্য বাঁচার মতো নিমড়বতম মজুরি নিশ্চিত করা। সকল প্রকার বেতন ও মজুরি বৈষম্য দূর করা। শ্রমিকদের ৫০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা। শ্রমিকদের জন্য ভেরিয়েবল ডি.এ প্রা চালু এবং সস্তা ও সুলভ মূল্যে স্থায়ী রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা। শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা। চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করা এবং চাকুরিতে পুনর্বহাল করা।

ঙ. ইপিজেডসহ সর্বত্র আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিক, কর্মচারী, ক্ষেতমজুরসহ শ্রমজীবী জনগণের অবাধ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ওপর মাফিয়া গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও আমলাতান্ত্রিকতা দূর করে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা।

চ. বর্তমানের অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন বাতিল করে শ্রমিকদের অনুকূলে যুগোপযোগী নয়া শ্রম আইন প্রণয়ন করা। শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা, পরিপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও ধর্মঘটের অধিকার নিশ্চিত করা। শ্রম আইন ২০০৬-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬ ধারা বাতিল করা। আদালতে সুনির্দিষ্ট অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত নিষিদ্ধ করা।

ছ. প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। ইমারত নির্মাণ বিধিমালার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা। নির্মাণ শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক, গৃহশ্রমিক প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের নির্দিষ্ট ধরনের সমস্যাগুলো নিরসন করা এবং তাদেরকে ন্যূনতম অধিকারসমূহ প্রদান ও বিশেষ অধিকার ও প্রয়োজন পুরনের ব্যবস্থা করা।

জ. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অর্থনীতির বর্তমান অনুৎপাদনশীল, লুটপাটের ধারা বন্ধ করে উভয় খাতে ও উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

৬) অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থাপনা

ক. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই ভিত্তিতে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি নীতি রচনা করা। আগামী ৫ বছরে ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. ঋণখেলাপি, অসৎ ও লুটেরা ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিতাড়িত করা, অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের হিসাব আদায় ও তা বাজেয়াপ্ত করা। দুর্নীতি, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ব্যয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি কঠোরভাবে দমন করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা। উৎপাদন অনুকূল সকল শক্তি ও উপাদান তথা কায়িক শ্রম, মানসিক শ্রম, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ প্রভৃতির ইতিবাচক অবদান নিশ্চিত করা। বিশ্ববাজারের অসম প্রতিযোগিতার মুখে জাতীয় শিল্প-কারখানার স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করা।

গ. জাতীয় অর্থনীতি ও দেশীয় শিল্প বিকাশের পথে প্রতিবন্ধতকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ বন্ধ করা। বহুজাতিক সংস্থা ও বিদেশী পুঁজির জাতীয় স্বার্থবিরোধী নিঃশর্ত ও অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

ঘ. অসম ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তির ভিত্তিতে তেল-গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে তুলে দেয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করা। বেসরকারি খাতে চট্টগ্রাম কন্টেইনার পোর্ট নির্মাণ এবং সে জন্য দেশের ভূ-খণ্ডকে তাদের কাছে লিজ প্রদানের প্রচেষ্টা বাতিল করা। চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্র বন্দরের আধুনিকায়ন করা ও উনড়বত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

ঙ. ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিনিয়ন্ত্রণ, উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা। রাষ্ট্রীয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উনড়বত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে ব্যক্তিখাতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের শিল্প-ব্যবসার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের সহায়তা প্রদান করা। উৎপাদন ও সেবামূলক খাত বিকাশের স্বার্থে ব্যক্তি, সমবায় ও অন্যান্য মিশ্র খাতকে সহায়তা প্রদান করা। শিল্পের ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা। টেকসই উনড়বয়ন কৌশল নির্ধারণ করা। তথ্য-প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজিসহ আধুনিক উনড়বত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা এবং জাতীয়ভাবে এসবের ব্যবহারের ভিত্তি গড়ে তোলা। প্রবাসীদের অর্জিত আয়-উপার্জনকে দেশে বিনিয়োগ করার জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারায় জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ নিশ্চিত করা। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভিত্তিক পরিকল্পনা করে নিচ থেকে উনড়বয়ন কার্যক্রমের ধারা এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা। সকল পর্যায়ের পরিকল্পিত উনড়বয়ন ও সেবামূলক কার্যংমের ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন প্রিয়ায় সংশিস্নষ্ট এলাকার জনগণের, বিশেষত সংশিস্নষ্ট উৎপাদক, কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সুষম উনড়বয়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে অনগ্রসর এলাকা এবং প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ রাখা।

ছ. তৃতীয় বিশ্বের উনড়বয়নশীল দেশের অনুকূলে বিশ্ব বাণিজ্যে ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং প্রকৃত সমতার ভিত্তিতে 'নয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্বার্থ সম্পনড়ব উনড়বয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা। বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার জন্য সচেষ্ট থাকা। ডবিস্নউটিও, এডিবি, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যায় শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করা এবং শর্তাবলী জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অনুকূলে পরিবর্তন করার জন্য সব রকম প্রয়াস চালানো। গণতান্ত্রিক বিশ্বায়নের আওতায় শ্রমের অবাধ চলাচলের দাবিতে বিশ্বব্যাপী যে সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

জ. সামরিক খাত ও মাথাভারী প্রশাসনসহ সকল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে হ্রাস করা। জাতীয়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে বা উৎপাদন করা সম্ভব এ ধরনের পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা। দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য একান্তভাবে

প্রয়োজনীয় নয়, এমন পণ্যের ও বিলাসদ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা। ভোগবাদী প্রবণতা রোধ ও মিতব্যয়ীতার ধারায় জাতীয় বিকাশের আন্দোলন সৃষ্টি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

ঝ. জাতীয় উনড়বয়ন বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে মোটা দাগে এক-তৃতীয়াংশ অবকাঠামোগত উনড়বয়নের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সামাজিক কার্যক্রমের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট রাখা।

ঞ. দেশের বিত্তবানদের জন্য কর বেয়াত প্রদান বন্ধ করে তাদের উপর প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি ও তা নিশ্ছিদ্র আয় নিশ্চিত করা। বাজেটে সাধারণ জনগণের ওপর আরোপিত পরোক্ষ করের অনুপাতহ্রাস করা।

ট. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং তাদের আয়-ব্যয়, সুদের হার ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সরকার ও সেবা গ্রহীতাদের কাছে এনজিও পরিচালকমণ্ডলীর জবাবদিহিতা এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা করা।

(৭) সংবিধান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতি

ক. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সংবিধানের ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম সংশোধনী বাতিল করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রসহ '৭২-এর সংবিধানের মূল ভিত্তিসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

খ. বাংলাদেশের অধিবাসী বাঙালি ও অন্যান্য জাতিসত্তার স্বকীয় বিকাশকল্পে একাধারে প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার প্রসার দৃঢ়মূল করা এবং একই সাথে অন্যান্য জাতিসত্তার অস্তিত্ব ও অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও বিকাশের অধিকার রক্ষা করা।

গ. অনড়ব, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে জনগণের মৌলিক নাগরিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা এবং তা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিধান প্রবর্তন নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, সংগঠন করার

স্বাধীনতা, ধর্মঘট করার স্বাধীনতা, সমাবেশ মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৫০৫ (ক) ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯ (ক) ধারা, প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স অ্যাক্ট, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৪ সালের সরকারি কর্মচারী অবসর বিধির ৯ (২) ধারা, জননিরাপত্তা আইন, নিরাপত্তা ও নিবর্তনমূলক আটক আইন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অ্যাক্ট, চলচ্চিত্র সংসদ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, সন্ত্রাস দমন আইন, বিভিনড়ব ধরনের সেন্সরশিপ, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ আইনসহ মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল নিবর্তনমূলক কালা-কানুন বাতিল করা। রাজনীতিতে ও প্রশাসনে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের হস্ত ক্ষেপ ও তৎপরতা বন্ধ করা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমননীতি বন্ধ করা। গণপ্রচার মাধ্যমসমূহের ওপর জনগণের কার্যকর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং বেতার-টিভিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

ঙ. ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক সকল বিধি বিলোপ করা।

চ. বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা এবং শাস্তি প্রদান করা। স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত কর। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রচারণা নিষিদ্ধ করা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় কাজ-কর্ম ও রাজনৈতিক প্রচার নিষিদ্ধ করা। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃক করা।

ছ. সামরিক ক্যু-দেতার মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করা এবং এর জন্য সাংবিধানিকভাবে শাস্তির বিধান করা।

জ. রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সকল তথ্য জনগণের অবগত হবার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঝ. জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে সকল স্তরের নির্বাচনকে অর্থ, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষমতাসীন সরকার ও প্রশাসনের নানা কারসাজি থেকে মুক্ত করা। যুদ্ধাপরাধী ও খেলাপিঋণ গ্রহীতাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ যে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা। জাতীয় সংসদের আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যয়সীমা ১৫ লাখ টাকাকে কমিয়ে ৩ লাখ টাকা করা। ভবিষ্যতে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রচারণা কাজ সরকারি অর্থে ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালুসহ সিপিবি'র ৫৩ দফা সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা।

ঞ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃক করা ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা এবং এক্ষেত্রে আইন ও বিধি-বিধানের ফাঁক-ফোঁকরগুলো বন্ধ করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। স্বল্প খরচে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সিআরপিসি এবং বিপিসি'র গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করা। আধুনিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারা সংস্কার সাধন করা। রাজনৈতিক বন্দিদের সিকিউরিটি প্রিজনার্স স্ট্যাটাস দেয়া।

ট. সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার করা।

ঠ. উপনিবেশিক যুগের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বাধীন দেশের উপযোগী গণতান্ত্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। দেশ রক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে সকল সক্ষম যুবক-যুবতীকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাসহ যুগোপযোগী প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা। দেশের প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল কার্যক্রম জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা।

ড. জনগণের কাছে জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ভোটার কর্তৃক যে কোন সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহার করার এবং পুনর্নির্বাচনের অধিকার ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(৮) ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামো ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামোকে (১) উপযুক্ত গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (২) স্বচ্ছতা (৩) জবাবদিহিতা (৪) জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে মৌলিকভাবে ঢেলে সাজানো। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা।

খ. স্বশাসিত, ক্ষমতাশালী, আর্থিক সক্ষমতাসহ পরিপূর্ণ কতৃত্বপূর্ণ এবং স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যদের পরিবর্তে নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার হাতে স্ব স্ব স্তরের প্রশাসনিক ও উনড়বয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্ব অর্পন করা। জাতীয় সংসদের উপর রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের তদারকির কাজ ন্যস্ত করা।

গ. উনড়বয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নির্বাচিত স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাকে উনড়বয়ন, আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসন, স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মসহ বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা। এসব স্থানীয় সংস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংবিধিবদ্ধভাবে বরাদ্দ রাখার বিধান করা। আদালতের নির্দেশ ছাড়া এই সকল সংস্থাকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশে বাতিল করার সুযোগ সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে রহিত করা। এই নতুন ব্যবস্থার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদসহ সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

ঘ. স্থানীয় সরকারের সকল স্তর ও কাঠামোতে পর্যায়ক্রমে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।

(৯) শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ক. সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, একই ধারার গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভিনড়ব সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা এবং তার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রায়োগিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সার্বজনীন করা। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য একটি ৫ বছরের ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যাপক জাতীয় অভিযান পরিচালনাসহ ব্যাপক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা। ৩ বছরের মধ্যে প্রতি ২ বর্গকিলোমিটারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮ বছরের মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার যথাযথ প্রসার ও উনড়বতি সাধন করা। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও শিক্ষা ঋণ প্রকল্প চালু করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।

খ. পর্যায়ক্রমে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করার উদ্যোগ নেয়া। ইউনেস্কো'র সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে জাতীয় আয়ের ৮% বরাদ্দ দেয়া।

গ. সকল জাতিসত্তার জন্য প্রাথমিক স্তরে স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

ঘ. শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা, পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা ও তাদের অন্যান্য ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করা। শিক্ষকদের পেশাগত কাজে দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত প্রাথমিক স্তরে ১ ঃ ৪০ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১ ঃ ২৫ নিশ্চিত করা।

ঙ. জনগণের সুষ্ঠু, মানবিক, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারা অগ্রসর করা এবং জীবনবিমুখ, ভোগবাদী, অশস্নীল, কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ করা। সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, কুসংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিকাশ ঘটানো। জনগণের সকল সৃজনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা ও উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো।

চ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, মানবতাবোধ ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা জাগরিত ও প্রসারিত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

(১০) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

ক. সকল নাগরিকের জন্য সুষম ও অভিনড়ব গণমুখী চিকিৎসা নীতি, স্বাস্থ্য নীতি ও ওষুধ নীতি চালু করা।

খ. প্রতিটি ইউনিয়নে মাতৃসদন, শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র ও গণস্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের সুবিধাদিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা। হাসপাতালগুলোতে উনড়বত চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রসারিত করা এবং সেখানে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের জন্য চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

গ. দেশের সকল মানুষের জন্য আর্সেনিক ও জীবানুমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা।

ঘ. বিভিনড়ব দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করা। হোমিওপ্যাথি, বায়োক্যামি, আয়ুর্বেদীয়, হেকিমী ও অনানুষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উনড়বয়ন করা।

(১১) শিশু-কিশোর, যুব সমাজ ও বৃদ্ধ-দুঃস্থ নাগরিকবৃন্দ

ক. শিশু-কিশোরসহ দেশের নতুন প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা। শিশুদের সৃষ্টিশীল বিনোদনের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ও কাঠামো গড়ে তোলা। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার করে সংরক্ষণ করা। সরকার ও ব্যক্তিমালিকানাধীন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকল এলাকায় যেন শিশুদের খেলার মাঠ থাকে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া। শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন কমিশন গঠন করা। সংকীর্ণ স্বার্থে সহিংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশুদের সম্পৃক্ত করা কঠোরভাবে রোধ করা। শিশুদের সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারি উদ্যোগ নেয়া। সমাজের বঞ্চিত শিশুদেরকেও এসব সংগঠনে সম্পৃক্ত করা। বঞ্চিত শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন করা।

খ. দেশের যুব সমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা, হতাশাগ্রস্ততার মুখে মাদকাশক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস, নৈতিকতা-হীনতার গ্রাস থেকে মুক্ত করা। দেশ গঠনে যুব সমাজের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেয়া।

গ. দেশের গ্রাম ও শহরের অসহায় বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, আবাসন কেন্দ্র, সেনিটোরিয়াম সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। পথশিশুসহ অভিভাবকহীন দুঃস্থ মানুষের জন্য রাত্রিকালীন নিবাস স্থাপনসহ আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও জীবন ধারণের সুযোগ করে দেয়ার সুবিধার্থে তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

(১২) নারী সমাজ

ক. নারী সমাজের ওপর পরিচালিত নানা অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য দূর করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলসহ সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমান অংশগ্রহণ, সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, ১৯৭৯ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ তথা 'সিডও সনদ' (কোনো রকম সংরক্ষণ ছাড়াই), ১৯৯৩ সালে ঘোষিত ভিয়েনা সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষিত বেইজিং কর্মসূচি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। যৌতুক প্রা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন কার্যকরভাবে রোধ করা। নারী ও শিশু পাচার রোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কন্যা শিশুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 'পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা। 'ি মিনাল প্রসিডিউর কোড' এবং 'অ্যাভিডেন্স অ্যাক্ট'-এ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ধারাসমূহ শনাক্ত ও দূর করা। 'অভিভাবক ও পোষ্য আইন ১৮৯০' সংশোধন করে অভিভাবক ও পোষ্য গ্রহণের বিধানে সমতা আনা। 'ইকুয়াল অপরচুনিটি অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা। এসব ছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত আইনে যেসব পিতৃতান্ত্রিক বিধান রয়েছে তার অবসান ঘটানো। বিদ্যমান পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা এবং ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার পূর্ণ বাস্ত বায়ন নিশ্চিত করা। ২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উনড়বয়ন নীতিমালাকে আরো বিকশিত করা এবং তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

গ. কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা। কর্মজীবী নারীদের জন্য ৩ মাস সবেতন প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঘ. সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক-তৃতীয়াংশ করা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। জেণ্ডার বিষয়ক সংসদীয় কমিশন গঠন করা। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া।

ঙ. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজ ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য থেকে নারীদের রক্ষা করা। ফতোয়াকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করে ২০০১ সালে হাইকোর্টে প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়কে কার্যকর করা। গার্মেন্টস্, রাইস মিল ও চাতাল, ইটের ভাটা প্রভৃতিসহ বিভিনড়ব ছোট-বড় সকল শিল্পে কর্মরত নারীদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান, কাজের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা, আবাসন ও যাতায়াত সুবিধা প্রদান, যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা, ছুটির ব্যবস্থা রাখা এবং বিভিনড়ব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হবার অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. পরিবারে ও গৃহস্থালী কাজে নারীর শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজ ও মজুরির ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ছ. নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সকল অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যμম চালু করা। নারীর প্রতি নেতিবাচক, গৎবাঁধা, অবমাননাকর, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সঠিক ভূমিকা, প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রচার মাধ্যমের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। রাস্তাঘাটে উত্যক্তকরণ বা ঈভ টিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রেখে আইন প্রবর্তন করা।

জ. প্রান্তিক নারী, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মূলধারায় যুক্ত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কথিত 'পতিতা'দের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা।

(১৩) ধর্মীয় সংখ্যালঘু

ক. সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সমান মর্যাদা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন, বৈষম্য, হয়রানি বন্ধ করা। এ জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু (অধিকার রক্ষা) কমিশন গঠন করা।

খ. কুখ্যাত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করা এবং সংশোধনী করে প্রণীত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এর আপত্তিকর বিধান সংশোধন করে কার্যকর করা। সম্পত্তির ওপর অংশীদারদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং এই আইন দ্রুত বাস্তবায়ন করে বঞ্চিতদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া।

গ. সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা।

(১৪) সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও আদিবাসী সমাজ

ক. সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর স্বকীয়তার পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান এবং সেই অনুসারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্র া এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। সকল জাতিসত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ. সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার স্বার্থ রক্ষা, অধিকার নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক ও উনড়বয়ন সহায়তা প্রদান এবং বিকাশের জন্য এ সকল জাতিসত্তার মানুষদের প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত পৃক প্রশাসনিক বিভাগ ও আদিবাসী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। শিৰা, চাকুরিসহ বিভিনড়ব ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা রাখা।

ঘ. ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চুক্তি'র পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত 'ভূমি কমিশন' সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বাস্তুভিটা ও ভূমির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

ঙ. জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সামাজ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে ভূমি ও প্রাণবৈচিত্র্য-জীববৈচিত্র্য বিনাশকারী সকল ধরনের তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করা। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও বনের ওপর আদিবাসীদের অধিকার ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে ভূমি কমিশন গঠন করা। ইকোপার্ক, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তোলার সময় আদিবাসীদের ওপর নিপীড়ন, আদিবাসীদের জীবন-জীবিকাকে বিপনড়বকরণ, বাস্তুচ্যুতকরণ ইত্যাদি বন্ধ করা। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের অস্তিত্ব, পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবিকাকে বিপনড়ব করে– এমন ধরনের তথাকথিত 'উনড়বয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা। যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. আলফ্রেড সরেন, পীরেন স্স্নান, সত্যবান হাজং, চলেশ রিছিল হত্যাকাণ্ডসহ আদিবাসীদের ওপর হত্যা, অত্যাচার, উৎপীড়নের ঘটনার বিচার করা। সমতল ভূমির সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওঁরাওসহ সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে একটি 'ভূমি কমিশন' গঠন করা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার খাস জমি বণ্টনে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। এ বিষয়ে ১৯৫০ সালের ভূমিস্বত্ত্ব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের শিক্ষা, সংস্কৃতির ওপর গবেষণার জন্য পৃক গবেষণা সেল খোলা।

জ. দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান সকল বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূর করা। অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করা। নবগঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য একটা বিশেষ সেল গঠন করা। দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান সকল বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূর করা।

(১৫) শহরের বস্তিবাসী ও নগরায়ন

ক. উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করা। দরিদ্র নিমড়ববিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্প চালু করা। বস্তিবাসীর জন্য পৌর জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। শহরের খাস জমি উদ্ধার করে সেখানে সরকারিভাবে কলোনি, ডরমিটরি ইত্যাদি নির্মাণ করে তা গরীব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ও বস্তিবাসীদের কাছে বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেয়া। বাস্তুহীন ও নিমড়ববিত্ত দরিদ্র সকল পরিবারের জন্য বছরের মধ্যে ন্যূনতম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

খ. দ্রুত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠা শহরগুলোতে পৌরসেবা কার্যμম ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। শহরতলির উনড়বতি সাধন এবং দক্ষ কমিউনিটিং সার্ভিস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গ. শহরগুলোতে যানজট, জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদী জরুরি কার্যব্যবস্থা গ্রহণ এবং মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ঘ. ভূমি জোনিং করা এবং ভূমি-ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সকল স্তরে স্থায়ী লোক নিয়োগ করা। সিএলও পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মালিকানা ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জটিলতা নিরসন করা।

(১৬) প্রতিবন্ধী জনগণ

ক. জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে শারীরিক, শ্রবণ, বাক্, দৃষ্টি ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ কনভেনশনের প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

খ. চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা নির্ধারণ, বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা। সকল সরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধী অনুকূল করে নির্মাণ নিশ্চিত করা।

গ. মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ. দারিদ্র্য নিরসন, জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোসহ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা।

ঙ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্বাচনে ভোট প্রদানের সহায়ক পরিবেশ ও বিশেষ ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা।

(১৭) তথ্য-প্রযুক্তি

ক. বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি ৰেত্রে যে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, সেই সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা। তথ্য-প্রযুক্তিগত সুবিধা সকলেই যেন সমানভাবে পায়, তা নিশ্চিত করা।

খ. গ্রাম-গ্রামান্তরে নিম্নবিত্ত জনগণের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে সস্তায় কম্পিউটার সরবরাহের মাধ্যমে কম্পিউটার স্বাক্ষরতা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

গ. বিশ্বব্যাপী তথ্য-প্রবাহের মহাসড়কের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করে সকলের জন্য তথ্য-প্রাপ্তির অবাধ গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত 'সাইবার মনোপলি'র বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার প্রসারিত করতে 'ই-গভরনেন্স' চালু করা।

(১৮) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু

ক. জরুরি ভিত্তিতে দেশের আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা। পানি, মাটি ও বায়ু দূষণের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কল-কারখানার বর্জ্য নদী কিংবা জলাশয়ে ফেলা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা। শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধন পস্ন্যান্ট লাগানো বাধ্যতামূলক করা। নদী-খাল-বিল-লেক-জলধার জবরদখলকারী, বন উজাড়কারী, বন দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা, বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পরিবেশ ধ্বংসকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা। পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশ দিয়ে তৈরি ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই লেকের চারপাশে বাঁধ উঁচু করে নতুনভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটানোর উদ্যোগ বন্ধ, উনড়বয়নের নামে বন ধ্বংসকারী তৎপরতা নিষিদ্ধ করা, পাহাড় কাটা ও ধ্বংস সাধন বন্ধ করা। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। বৃক্ষহীন বনাঞ্চলের পুনর্বাসন করা। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে জোরদার করা। ক্ষতিকর বিদেশী গাছ নিধন করা। পাহাড়, বন, নদী ও জলাশয় লিজ প্রদানের ক্ষমতা বাতিল করা।

গ. বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্মা ও কর্ণফুলীসহ দেশের সকল নদ-নদী এবং জলাধারের পাড় ও মধ্য থেকে অবৈধ স্থাপনাসহ অবৈধ দখল অবিলম্বে উচ্ছেদ করা। শুকিয়ে যাওয়া অন্তত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নদী পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ, খাল, পুকুর ও শহরের উন্মুক্ত স্থানগুলো সংরক্ষণ এবং হারিয়ে যাওয়া পার্ক, পুকুর, খাল ও উন্মুক্ত স্থানগুলো পুনরুদ্ধার করা।

ঘ. জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের দ্বারা সমুদ্র ও উপকূলের পরিবেশ দূষণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহের পরিবেশব অব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করা এবং পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থায় পরিকল্পিত চিংড়ি চাষের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

ঙ. ঢাকাসহ সারাদেশে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সমস্যার উনড়বতির জন্য টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত বেবি ট্যাক্সি নিষিদ্ধ করে সেগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা চালানোর উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান করা। এছাড়াও পরিবেশ দূষণ কমাতে সকল ধরনের যানবাহনে

ক্যাটালেটিক কনভার্টার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। সীসাবিহীন জ্বালানি তেলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ইস্টার্ন রিফাইনারির প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উনড়বয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা। ইটভাটা ও গৃহস্থালীতে প্রধান জ্বালানি হিসেবে জ্বালানি গ্যাস ব্যবহারের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

চ. নগরীর মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়বার ক্ষেত্রে পরিবেশগত আইন-কানুন কড়াকড়িভাবে মেনে চলা। শিল্পবর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য নিঃসরণ কঠোরভাবে বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। দূষণ নিয়ন্ত্রণে 'গ্রীন ট্যাক্স' আরোপ করা। মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ সম্মত, স্বল্প ব্যয়সাধ্য, সহজ পরীবীক্ষণ উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা। ১০০ ভাগ স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ছ. ক্ষতিকর কীটনাশক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং উনড়বত বিশ্বে নিষিদ্ধ কীটনাশক যাতে দেশে বাজারজাত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) ও সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থাপনা (IPNS) কার্যকর করা। জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা। কৃষিতে সেচব্যবস্থা সহজলভ্য করা। এই লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বহুগুন বাড়ানো। প্রয়োজনীয় অভায়শ্রম তৈরি ও সংরক্ষণ করা। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্বন গ্রাহক ৩ উপাদান: মাটি, গাছ ও পানির সর্বোত্তম সংরক্ষণ করা। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জনগণের মধ্যে সামগ্রিক পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। পরিবেশ আদালত গঠন করা।

(১৯) প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানী নীতি

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ জল, জমি, বন বিরাষ্ট্রীয়করণের আওতামুক্ত করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রাকৃতিক সম্পদ শত ভাগ জনগণের মালিকানায় রেখে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় স্বার্থকে সকল প্রকার বাণিজ্যিক স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা। তেল-গ্যাস-কয়লা ও তা থেকে সৃষ্ট পণ্য আইন করে রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

খ. উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনির নামে পরিবেশ, প্রকৃতি ধ্বংস বন্ধ করা। 'ফুলবাড়ী চুক্তি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা। টেংরাটিলা গ্যাস বিস্ফোরণের জন্য দায়ী 'নাইকো'র কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা। লাউয়াছড়ায় শেভরনের অনুসন্ধান কার্যংম বন্ধ করা। মাগুরছড়া বিস্ফোরণের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

গ. দেশের পানি সম্পদ, ভূমি সম্পদ ও মানব সম্পদের যথাযথ সমন্বয় ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা। 'কোলবাংলা' গঠন ও বাপেক্সসহ জাতীয় সংস্থাসমূহের বিকাশে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসম 'উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি' বাতিল করা। সমুদ্রে গ্যাস-তেল সম্পদ অনুসন্ধানে বর্তমানের রপ্তানিমুখী 'পিএসসি' বাতিল করা। সম্পদ ও সমুদ্রের উপর জাতীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে সমুদ্র সীমা সংণন্ত অস্পষ্টতা-অনিশ্চয়তা দূর করা।

ঙ. জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ জ্বালানি নীতির অধীনে দেশীয় জ্বালানি সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ. স্বনির্ভর প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জন, অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানির দেশীয় ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ছ. বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০ বছরের মধ্যে দ্বিগুন করার কাজ অগ্রসর করা। ৫ বছরের মধ্যে তা কমপক্ষে ৩৩% বৃদ্ধির জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণের জন্য গ্যাস-জল-সৌরশক্তি-হাওয়া ইত্যাদি নিরাপদ উৎসগুলো ব্যবহার করা।

জ. আগামী ১ বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে এবং আগামী ৪ বছরের মধ্যে দেশের সর্বত্র গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(২০) পানি উন্নয়ন ও বন্যা সমস্যা

ক. যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা ও বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় ভৌগলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং এজন্য জাতীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া।

খ. একটি সামগ্রিক পানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং তার আওতায় সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা।

গ. দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওরসহ সমস্ত পানি সম্পদকে একটি পানি ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনার অধীনে এনে তার দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(২১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ক. দুর্যোগ পূর্ব আধুনিক সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপন করা। দক্ষ, টেকসই, উন্নত, জনসম্পৃক্ত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

খ. দুর্যোগ পরবর্তী নিরাপদ খাদ্য, পানি ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

গ. প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।

(২২) যোগাযোগ ব্যবস্থা

ক. নৌপথ, রেলপথ, রাজপথ ও আকাশপথসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উনড়বয়নে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা জাতীয় স্বার্থে কার্যকর করা।

খ. পরিবেশ সহায়ক, সহজলভ্য, পথচারী বান্ধব বিকল্প গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করা। গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রভূতভাবে প্রসারিত করা এবং তার দক্ষ ও লাভজনক পরিচালনা নিশ্চিত করা। নতুন কাঠামো গড়ার চেয়ে বিদ্যমান অবকাঠামো (যেমন পরিত্যক্ত রেলপথ) পুনর্বাসনের মাধ্যমে তা সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ. নৌপথ ও রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও বিকাশে অগ্রাধিকার দেয়া। পরিকল্পিতভাবে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করা।

(২৩) জনসংখ্যা

ক. অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ. সকল মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দেশের বিপুল জনশক্তির সৃজন ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর ভিত্তিতে উৎপাদনের অন্যান্য সব সম্ভাব্য উপাদানের সবচেয়ে দক্ষ ও উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা। ছোট পরিবার গঠনের বিষয়টিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদির ব্যবহার জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করা। এসব প্রয়াসের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা।

(২৪) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ক. স্বাধীন ও সক্রিয় জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা। পারস্পরিক স্বার্থ, সমমর্যাদা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

খ. আন্তর্জাতিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গণতন্ত্রায়ন, জাতিসংঘ ও তার বিভিনড়ব সংস্থার গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিটি জাতির বিকাশের নিজস্ব পথ বাছাইয়ের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় প্রয়াস চালানো।

গ. স্থায়ী বিশ্বশান্তি ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য দৃঢ় ও সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো।

ঘ. সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, বর্ণবাদ, জায়নবাদ, নব্য নাৎসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা এবং এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি ও আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা।

ঙ. তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে বহুমাত্রিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও জোরদার করা। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে বহুমাত্রিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

চ. ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি এসব দেশের সঙ্গে ঝুলে থাকা সমস্যাগুলো, যথা ভারতের সঙ্গে সকল নদীর পানির বণ্টন, সীমানা চিহ্নিতকরণসহ বিরাজমান সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায় ও আটকেপড়া পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠানো ইত্যাদি সমস্যা জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণড়ব রেখে সমাধান করা। উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করা এবং এ অঞ্চলে আত্মঘাতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ করা।

ছ. 'সার্ক' সংস্থার কার্যক্রমকে বহুমুখী ধারায় প্রসারিত করা এবং তার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত ও গভীরতর করা। 'সার্ক' দেশসমূহের জনগণ ও গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তি ও আন্দোলনসমূহের মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা গভীরতর করা।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র নির্বাচনী ইশতেহারের উপরোক্ত বক্তব্য ও কর্মসূচির পক্ষে পার্টির মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'কাস্তে' মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ও কর্মসূচির সমর্থনে এগিয়ে আসুন

কমিউনিস্ট পার্টি মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'কাস্তে' মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন

জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, আমরা সেই প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি